IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পের রূপ ও রীতি

ড. মৌসুমী পাল, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর,
স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ

প্রত্যেক লেখকেরই একটা নিজস্বতা থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ নিয়ে একই বিষয়কে প্রত্যক্ষ করেন দু'জন লেখক। ফলে তাঁদের রচনাশৈলী হয়ে উঠে ভিন্নধর্মী। সমসাময়িক সমাজ ও কালের চিত্র তাঁদের রচনায় ফুটে উঠে। এর সঙ্গে মিশ্রিত হয় শব্দচয়ন, বাকভঙ্গি, অনুচ্ছেদসজ্জা, বাক্যগঠন ইত্যাদি প্রকরণের বিভিন্ন দিকগুলো। লেখকের রচনার রূপ ও রীতি নির্ভর করে অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, বৈদগ্ধ্য, উপলব্ধি, ভাষাবোধ, আলঙ্কারিক জ্ঞান ইত্যাদির উপর। লেখকের অভিজ্ঞতা যত বেশি হবে, তাঁর রচনাও হবে তত বেশি বৈচিত্র্যময়। অনুভূতির গভীরতা থেকে আসবে নাটকীয় চমক, আকস্মিকতা। সমৃদ্ধ ও উন্নত শব্দভান্ডার লেখককে যথোপযুক্ত শব্দচয়নে ও শব্দ ব্যবহারে দক্ষ করে তোলে।

রচনার রূপ বা রীতি হল লেখকের প্রকাশকৌশল। প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব রচনালক্ষণ কিছু আছে। ধ্বনিবিন্যাস, শব্দসংস্থান, বাক্যযোজনা, অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদ রচনা, রচনার আরম্ভ ও উপসংহার - ইত্যাদি সমস্ত কিছুতেই সেই লক্ষণগুলি ধরা পড়ে। রূপরীতির ক্ষেত্রে উল্লেখিত গুণাবলীর মধ্যে সবগুলিই গল্পকার রমাপদ চৌধুরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। লেখকের সমস্ত রচনার উপর ভিত্তি করে এই সর্বাঙ্গীণ শৈলীর ধারণাটি গড়ে ওঠে। ফলে একজন লেখক অন্য আরেকজন লেখক থেকে হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র। গল্পকার রমাপদ চৌধুরীর ক্ষেত্রেও এই কথাটিই প্রযোজ্য। তাঁর বিভিন্ন গল্পগুলির ভিন্ন ভিন্ন রীতি পর্যবেক্ষণ করে তাঁর গল্পগুলির রূপ ও রীতির পর্যালোচনা করবো আমার সার্বিক আলোচনায়।

সূচক শব্দ: রচনাশৈলী, রূপ, রীতি, প্রকাশকৌশল, ধ্বনিবিন্যাস, শব্দচয়ন, বাক্যসজ্জা, আঙ্গিক, ভাষারীতি, উপসথাপনরীতি

যে কোনো লেখকেরই একটা নিজস্বতা থাকে। এই নিজস্বতা তাঁর রচনার রীতি ও প্রকরণগত। প্রত্যেক লেখকের সামাজিক-পারিবারিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি, অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি স্বতন্ত্র। ফলে রচনার ক্ষেত্রে একই বিষয় নিয়ে লিখলেও দু'জন লেখকের রচনাভঙ্গি আলাদা হয়। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ নিয়ে একই বিষয়কে প্রত্যক্ষ করেন দু'জন লেখক। ফলে রচনাশৈলী হয়ে উঠে ভিন্নধর্মী। লেখকের রচনাশৈলী থেকেই চিহ্নিত করা যায় তাঁর রচনাকে। "লেখকের ব্যক্তিগত বিশিষ্টতাই তাঁকে বিভিন্ন ধরনের শব্দ এবং শৈলী ব্যবহারে অনুপ্রেরণা দেয়। এটাই শৈলীবিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব।"১ ধ্বনিসজ্জা, শব্দপ্রয়োগ, বাক্যিক নির্মাণ, অলঙ্কারের ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে কোন্ লেখকের রচনা তা নির্ধারণ করা সম্ভব।

লেখকও সামাজিক মানুষ। তাই কোন বিশেষ সময়ে তার অবস্থানের ফলে সমসাময়িক সমাজ ও কালের চিত্র তাঁর রচনায় ফুটে উঠে। এর সঙ্গে মিশ্রিত হয় শব্দচয়ন, বাকভঙ্গি, অনুচ্ছেদসজ্জা, বাক্যগঠন ইত্যাদি প্রকরণের বিভিন্ন দিকগুলো। "লেখকের নিজস্ব সত্তার ভেতর থেকে জন্ম নেয় কোন রচনা। মাতৃগর্ভে যেভাবে প্রাণের উন্মেষ পরিপুষ্ট হতে থাকে এক নিগূঢ় রহস্যময়তায়, সুচারু বিন্যাসে, সৃষ্টিধর্মী রচনার ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধাঁচের প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল।"২

রচনার রূপ বা রীতি হল লেখকের প্রকাশকৌশল। লেখকের রচনার রূপ ও রীতি নির্ভর করে অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, বৈদগ্ধ্য, উপলব্ধি, ভাষাবোধ, আলঙ্কারিক জ্ঞান ইত্যাদির উপর। লেখকের অভিজ্ঞতা যত বেশি হবে, তাঁর রচনাও হবে তত বেশি বৈচিত্র্যময়। অনুভূতির গভীরতা থেকে আসবে নাটকীয় চমক, আকস্মিকতা। সমৃদ্ধ ও উন্নত শব্দভান্ডার লেখককে যথোপযুক্ত শব্দচয়নে ও শব্দ ব্যবহারে দক্ষ করে তোলে। ফলে নির্মাণ হয় সুসংগত। "প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব রচনালক্ষণ কিছু আছে। ধ্বনিবিন্যাস, শব্দসংস্থান, বাক্যযোজনা, অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদ রচনা, রচনার আরম্ভ ও উপসংহার - ইত্যাদি সমস্ত কিছুতেই সেই লক্ষণগুলি ধরা পড়ে।"**৩** রূপরীতির ক্ষেত্রে উল্লেখিত গুণাবলীর মধ্যে সবগুলিই গল্পকার রমাপদ চৌধুরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শব্দ ব্যবহারে রমাপদ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। একই শব্দকে পাশাপাশি দু'বার ব্যবহার করে আগ্রহ, ব্যস্ততা, দুশ্চিন্তা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বক্তব্যের গভীরতা বোঝানোর জন্য দু'বার বা তিনবার ব্যবহার করেছেন একই শব্দ। তাঁর ব্যবহৃত শব্দ কোন কোন সময় একটা পূর্ণাঙ্গ চরিত্রকে প্রকাশ করেছে। গল্পের চরিত্র ও তাদের বক্তব্যকে যখন জোরালো করতে চেয়েছেন, রমাপদ চৌধুরী তখন দু'বার ব্যবহার করেছেন একই শব্দকে। দীর্ঘকাল বা দীর্ঘসময়কে বোঝানোর জন্যও একই শব্দকে দু'বার ব্যবহার করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে একই বাক্যকেও পাশাপাশি দু'বার ব্যবহার করেছেন রমাপদ। ছোট ছোট বাক্যের দ্বারা অনুচ্ছেদ নির্মাণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্রকে অথবা একটা গোটা পরিবেশকে মূর্ত করে তুলেছেন। শব্দের স্থান বদল করে বাক্যগঠনে অভিনবত্ব এনেছেন। ভিন্নধর্মী বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে রমাপদ কোথাও কোথাও কৌতুহলী করে তুলেছেন পাঠককে।

" ভাষা দিয়েই গড়ে ওঠে চরিত্র, চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, প্লটের বিন্যাস প্রভৃতি।"**৪** রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পের ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। ভিন্নধর্মী ভাষা ব্যবহার করে চরিত্রের সামাজিক অবস্থানকে প্রকাশ করেছেন তিনি। রমাপদ চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষাবৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন কয়েকটি গল্পে। সাঁওতালদের ব্যবহৃত ভাষাকে হুবহু ব্যবহার করে লেখক পটভূমি অনুযায়ী গল্পকে বাস্তবানুগ করে তুলেছেন। এই ভাষারীতি পর্যবেক্ষণ করলে রমাপদর অন্যান্য গল্পের ভাষার সঙ্গে পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি, বিলাসপুর, ছত্রিশগড়, রাঁচি, রামগড় প্রভৃতি অঞ্চলের সাঁওতাল, হো, ওঁরাও, মুন্ডা ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা এইসব গল্পকে আর জীবিত করে তুলেছে। গল্পকার দেখিয়েছেন ভাষার মাধ্যমে কীভাবে সেই অঞ্চল, তাদের জীবনযাত্রা ইত্যাদিকে পূর্ণাঙ্গরূপে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা যায়। ভাষারীতির মাধ্যমে চরিত্র নির্মাণের রূপকারও তিনি।

আঙ্গিকের দিক থেকে রমাপদ চৌধুরী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশ্বাসী। আত্মকথনরীতি বা প্রত্যক্ষরীতি ও বর্ণনামূলক রীতি বা পরোক্ষারীতি - এই দুই ধরনের উপস্থাপনরীতি সাহিত্যে প্রচলিত। রমাপদর গল্প উভয়রীতিতেই বিচরণ করেছে অবলীলায়। কিন্তু প্রকরণের দিক থেকে তিনি আলাদা এই কারণে যে এই দুই রীতির পাশাপাশি পত্রাঙ্গিক ও নাট্যাঙ্গিকধর্মী গল্পও রচনা করেছেন, যার দ্বারা পাঠক চিত্তে অনায়েসেই ছাপ ফেলতে সমর্থ হয়েছেন। গল্প উপস্থাপন করতে গিয়ে শুরুতেই তিনি অভিনবত্বের পরিচয় দেন।

কোন কোন গল্পের শুরুতেই চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হন পাঠক। চরিত্রের দোষ, গুণ ইত্যাদি গল্প শুরুর প্রথম বাক্যেই প্রকাশিত হয়। 'শেষ হয়েও হইল না শেষ'**৫** ছোটগল্প সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথ কথিত এই বৈশিষ্ট্যটি রমাপদর গল্পে দুর্লক্ষ্য নয়। তবে এই শেষ হয়েও শেষ না হওয়ার মধ্যেই থাকে চমক, আকস্মিকতা। তাঁর কোন কোন গল্পের শুরুতে রয়েছে রহস্যময়তা। কোথাও কোথাও গল্পের প্রথমে তিনি তৈরি করে নেন ভূমিকা। তারপরে গল্পের অভ্যন্তরে প্রকাশ করেন। নামকরণের ক্ষেত্রে সাহিত্য সমালোচক নির্দেশিত দুই ধরনের নামকরণে আগ্রহী তিনি। পটভূমি হিসেবে তিনি রাঁচি, রামগড়, ছত্রিশগড়, বিলাসপুর অঞ্চলকে যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি সমুদ্র, পাহাড়, নদী, বনজঙ্গলকেও তিনি পটভূমি হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। কোন কোন গল্পে রেল বা রেলস্টেশন হয়ে উঠেছে গল্পের পটভূমি।

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পের কাহিনীর আড়ালে একটি অন্তর্নিহিত বক্তব্য থাকে, যে বক্তব্য মানুষের নৈতিক বোধকে জাগ্রত করে। এই অন্তর্নিহিত বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে তাঁর মধ্যবিত্ত জীবননির্ভর গল্পগুলিতে। ত্রিকোণ প্রেম সম্পর্কের চিত্রণও তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি রূপ লাভ করেছে তাঁর বিভিন্ন গল্পে। কিছু গল্পে বিভিন্ন চরিত্রের পেশাকে কেন্দ্র করে বিবৃত হয়েছে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থাও। এই আর্থসামাজিক অবস্থার পাশাপাশি নারীর রূপ সৌন্দর্যও অবহেলিত হয়নি রমাপদর ছোটগল্পে। ভাব, ভাষা, অলঙ্কারে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর গল্পের রীতি ও প্রকরণ।

প্রকৃতির বর্ণনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে রমাপদর গল্প। পুকুর, নদী, নালা, সমুদ্র, ধানজমি, সবুজের সমারোহ, নীল আকাশ, ঝড়ের মত্ততা, পাহাড়-পর্বত, চাঁদ ইত্যাদি প্রকৃতির বিভিন্ন অঙ্গগুলি অন্য মাত্রা পেয়েছে তাঁর লেখনীতে। দিন-রাত, সকাল-দুপুর এমনকি সন্ধ্যার প্রকৃতিও এদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পে। বর্ণনার গুণে প্রকৃতি যেন একটা গোটা চরিত্র হয়ে দেখা দেয়। ঐতিহাসিক ঘটনা, ঐতিহাসিক চরিত্র রমাপদর ছোটগল্পে আলাদা মর্যাদা পেয়েছে। জনপ্রিয় ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস 'লালবাঈ' এর লেখক রমাপদ ছোটগল্পে ইতিহাসকে নিয়ে এসেছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসের সঙ্গে মিশ্রিত করেছেন কল্পনাকে। ফলে একটা নিটোল গল্প বলতে যা বোঝায় তা লক্ষ্য করা গেছে তাঁর ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলিতে। যদিও এগুলির সংখ্যা নিতান্তই কম, তবু যে কয়টি গল্প তিনি লিখেছেন তার দ্বারাই শৈলীর দিক থেকে তিনি স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর বহনকারী।

অলঙ্কারের প্রয়োগ প্রধানত কবিতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু প্রকরণের ক্ষেত্রে রচনায় অনন্যতা আনতে চান যে লেখক তিনি গল্পেও ব্যবহার করেন বিভিন্ন আলঙ্কারিক বাচ্য। "রচনার শৈলী গড়ে ওঠে তার আলঙ্কারিক আবরণের মাধ্যমে। অনুপ্রাস, উপমা, সুভাষণ প্রভৃতি নানা অলঙ্কারের সমাবেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচনার সৌকর্যের নির্মাণ করে।"**৬** আলঙ্কারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে রচনায় লেখকের নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতার অবকাশ থেকে যায়। ভাষার মূর্তরূপে শব্দালঙ্কার আর ভাবরূপে অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্য দেখা যায়। বাক্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ বাক্যকে করে তোলে অর্থবহ, সৌন্দর্যময়। রমাপদর বিভিন্ন গল্পে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের ব্যবহার লক্ষণীয়। অনুপ্রাস, উপমা, অপহ্নতি ইত্যাদি নানাবিধ অলঙ্কারের সাহায্যে লেখকের রচনার অন্তর্গত বাক্য হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যমন্ডিত।

একজন লেখক তার নিজের ধরনে শব্দগ্রহণ, শব্দসন্নিবেশ, বাক্যনির্মাণ, স্তবক বা অনুচ্ছেদ নির্মাণ ইত্যাদির সাহায্যে তাঁর রচনার দেহটিকে গড়ে তোলেন। "একজন লেখকের শৈলীর-গদ্য হোক, পদ্য হোক- একটা সামগ্রিক সর্বাঙ্গীণ চেহারা থাকে। এই সামগ্রিক শৈলী বিশিষ্টতাবাচক, তা এক লেখককে অন্য লেখক থেকে আলাদা করে দেয়। মানুষের চেহারা যেমন আলাদা, লেখকে লেখকে শৈলীও তেমন আলাদা।"**৭** লেখকের সমস্ত রচনার উপর ভিত্তি করে এই সর্বাঙ্গীণ শৈলীর ধারণাটি গড়ে ওঠে। ফলে একজন লেখক অন্য আরেকজন লেখক থেকে হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র। গল্পকার রমাপদ চৌধুরীর ক্ষেত্রেও এই কথাটিই প্রযোজ্য। তাঁর বিভিন্ন গল্পগুলির ভিন্ন ভিন্ন রীতি পর্যবেক্ষণ করে তাঁর গল্পগুলির রূপ ও রীতির পর্যালোচনা করব।

পটভূমি

রাঁচি, রামগড়, ছত্রিশগড়, বিলাসপুরের আদিবাসী ও কয়লাখনি অঞ্চলকে পটভূমি করে রমাপদ অনেকগুলো গল্প লিখেছেন। এর মধ্যে নাম করা যায় 'দরবারী', 'জলরঙ', 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী', 'ঝুমরা বিবির মেলা', 'মানুষ অমানুষের গল্প', 'বিবিকরজ' প্রভৃতি গল্পের। মুন্ডাদের বাসস্থান আদিবাসী অঞ্চলকে পটভূমিতে রেখে তাঁর 'দরবারী' গল্পটি লিখিত। কোলিয়ারীর খাদে কর্মরত মুন্ডাদের জীবনচিত্র নিয়ে লেখক 'জলরঙ' গল্পের পটভূমি নির্মাণ করেছেন। বিলাসপুর অঞ্চলের খাড়িয়া, ভুম্পি, মুন্ডা মাঝিদের খুঁজে পাওয়া যায় 'বিবিকরজ' গল্পে। আদিবাসী অঞ্চল, সেখানকার বসবাসকারী আদিবাসী মুন্ডা, ওঁরাও-দের জীবনযাত্রাকে পটভূমি করে রচিত লেখকের 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী'। 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পের পটভূমি হল ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি পর্যন্ত কোলিয়ারী অঞ্চল।

রমাপদ চৌধুরী তাঁর বিভিন্ন গল্পে সমুদ্র, পাহাড়, নদী, বনজঙ্গলকে পটভূমি করেছেন। সমুদ্রের পটভূমিতে বর্ণিত হয়েছে 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া', 'ঝিনুকের কৌটো', 'বাবুই'। নদী বিশেষভাবে স্থান করে নিয়েছে 'বনবাতাস', 'বুড়ি ডিহিঙের সাঁকো', 'শেষ সংলাপ', 'সহযোগ' গল্পে। পাহাড়, বনজঙ্গল পটভূমি হয়ে উঠেছে 'আহ্লাদী', 'তিতির কান্নার মাঠ', 'বিবিকরজ' ইত্যাদি গল্পে। রেল, রেলজংশন, রেলস্টেশন ইত্যাদিকে পটভূমি করে রমাপদ চৌধুরী লিখেছেন 'উদয়াস্ত', 'আপট্রেন', 'চাবি', 'ভারতবর্ষ', 'তিতির কান্নার মাঠ' প্রভৃতি গল্প।

নামকরণ

সমালোচকের মতে, নামকরণের নানা পদ্ধতি রয়েছে। বাংলা সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত নিলে দেখা যাবে নামকরণ কখনো বিষয়কেন্দ্রিক, কখনও চরিত্রকেন্দ্রিক, কখনো কখনো স্থানকেন্দ্রিক, কখনো ব্যঞ্জনাধর্মী, শিল্প উদ্দেশ্যমূলক তথা তাৎপর্য কেন্দ্রিক। কখনো রূপক-প্রতীকধর্মী। **৮** গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য লেখক রমাপদ চৌধুরী দু'টি রীতি অবলম্বন করেছেন। প্রথমত, প্রধান পাত্র-পাত্রী, বস্তু বা স্থানের নাম অনুসারে। দ্বিতীয়ত, গল্পের মূলভাব বা ব্যঞ্জনা অনুসারে নামকরণ করেছেন। 'রুমাবাঈ', 'ইমলী', 'মাধবিকা', 'লীলাময়ী', নিকুঞ্জ লাহিড়ী ইত্যাদি গল্পের প্রধান পাত্র-পাত্রীর নামানুসারে নামকরণ করেছেন। বস্তুর নামানুসারে নামকরণ করেছেন 'ড্রেসিং টেবিল', 'ডাইনিং টেবিল', 'আলমারিটা', 'চাবি', 'আপট্রেন', 'ফ্রীজ', 'ঝিনুকের কৌটো' ইত্যাদি গল্পের। স্থান অনুসারে নামকরণ করেছেন 'তিতির কান্নার মাঠ', 'বুড়ি ডিহিঙের সাঁকো', 'বড়বাজার', 'ভারতবর্ষ' ইত্যাদি গল্পের। মূল কাহিনীর ভাবানুসারে বা ব্যঞ্জনানুসারে নামকরণ করেছেন 'উদয়াস্ত', 'সহযোগ', 'বনবাতাস', 'শিশুমেধ', 'স্বর্ণমারীচ', 'আতসী উজ্জ্বল', 'জ্বালাহর', 'রক্তবীজ', 'দুধের স্বাদ', 'ঠগ', 'নতুন চশমা', 'ঈর্ষা', 'আড়াল', 'দেয়াল' প্রভৃতি গল্পের ।

উপস্থাপনা রীতি

কাহিনী উপস্থাপনার দিক দিয়ে রমাপদ চৌধুরী বিভিন্ন রীতি অবলম্বন করেছেন। আত্মকথন রীতি বা প্রত্যক্ষ রীতির পাশাপাশি বর্ণনামূলক রীতি বা পরোক্ষ রীতিতে তিনি যেমন গল্প রচনা করেছেন, তেমনি পত্রাঙ্গিকে ও নাট্যাঙ্গিকেও তিনি কয়েকটি গল্প লিখেছেন। আত্মকথন রীতিতে লিখিত প্রতিনিধিত্বমূলক গল্পগুলি হল 'ডাইনিং টেবল', 'ড্রেসিং টেবিল', 'দিনকাল', 'আলমারিটা', 'আমরা সবাই একসঙ্গে', 'ফ্রীজ', 'ভারতবর্ষ', 'চাবি', 'আপট্রেন', 'বড়বাজার', 'তিতির কান্নার মাঠ', 'স্বর্ণলতার প্রেমপত্র', 'দুধের স্বাদ', 'খুনীবউ', 'রাঙ্গাপিসিমা', 'নতুন চশমা', 'ঈর্ষা', 'আজকের গল্প', 'আমি একটি সাধারণ মেয়ে', 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া', 'তিনটি প্রশ্ন' ইত্যাদি।

এই গল্পগুলির ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে তা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এই গল্পগুলির পটভূমি হয় মধ্যবিত্ত সমাজ নয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ও উত্তরকালীন সময় ও সমাজ। লেখক নিজে মধ্যবিত্ত সমাজের এবং অন্যদিকে চল্লিশের দশকের বাস্তব পরিস্থিতির প্রত্যক্ষদর্শী। কাজেই সেই ক্রান্তিকালের ও তার পরবর্তীকালের সমাজকে আত্মকথনরীতিতে উপস্থাপিত তিনি অনায়াসে করেন আর তা খুব আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

পরোক্ষরীতি অর্থাৎ বর্ণনামূলক রীতিতে রচিত গল্পগুলির মধ্যে নাম করা যায় 'শিশুমেধ', 'স্বর্ণমারীচ', 'আতসী উজ্জ্বল', 'তীরধনুক', 'অঙ্গপালীর 'জ্বালাহর', 'অভিসারিকা', 'দরবারী', 'রক্তবীজ', 'সম্ভব অসম্ভব', 'রেবেকা সোরেনের কবরো, 'সতী ঠাকরুণের চিতা', 'ঝুমরা বিবির মেলা', 'তালাক', 'মাধবিকা', 'সুর্মা', 'মানুষ অমানুষের গল্প', 'ঝিনুকের কৌটো', 'লোভ', 'একটি মনিব্যাগ ও একফালি হাসি', 'বসবার ঘর', 'শেষবৃষ্টি', 'নোনাজল', 'ছোট পৃথিবীর গল্প', 'একটি কিংবদন্তী' ইত্যাদি গল্পের। এই গল্পগুলিতে লেখক সর্বদ্রষ্টা। তিনি সমস্ত চরিত্রগুলোকে পরিচালিত করেন। এই গল্পগুলি পাঠকচিত্তকে সচকিত করে এবং বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এক বিশিষ্ট স্থানের দাবি রাখে ।

কাহিনীকে উপস্থাপনা করার রীতি পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন গল্পকার রমাপদ চৌধুরী। শুধুমাত্র গতানুগতিক বর্ণনামূলক রীতি ও আত্মকথন রীতিতে নয়, নাটকের মতো দৃশ্য ভাগ করেও যে গল্প লেখা সম্ভব রমাপদ তা করে দেখিয়েছেন। 'একটি ছোট্ট নাটক' গল্পে গল্প আছে, কিন্তু সেই গল্পটি রচিত হয়েছে নাটকের মত করে। অথচ নাটক লেখার প্রচলিত প্রথাকেও অস্বীকার করেছেন তিনি। দৃশ্য ভাগ করে মোট সাতটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটক তথা গল্পটি বলে গেছেন লেখক। অথচ কোন দৃশ্যেই নাটকের মত করে চরিত্র কিংবা সংলাপ ব্যবহার করেননি তিনি। প্রত্যেকটি দৃশ্যে গল্প বলার মত ঘটনাটিকে সাজিয়েছেন। গল্প বলার এই নতুন রীতি রমাপদকে বাংলা গল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র আসন দিয়েছে।

'একটি হাসপাতালের জন্ম ও মৃত্যু' গল্পের উপস্থাপনা রীতিতেও চমৎকারিত্ব রয়েছে। এতে চিঠির মাধ্যমে গল্পের মূল কাহিনীকে তুলে ধরা হয়েছে। অনেকগুলি চরিত্রকে উদ্দেশ্য করে একজনের লেখা কতগুলো

চিঠির মাধ্যমে গল্পের অবয়ব এবং কাহিনীকে গড়ে তুলে রমাপদ চৌধুরী গল্প রচনায় নিজের জাত ছিনিয়েছেন।

'আজকের গল্প' গল্পটির মধ্যে উপস্থাপনা রীতির অভিনবত্ব চোখে পড়ে। গল্পটির সমাপ্তির পর 'পুনশ্চ' অংশের মধ্যেই গল্পের মূল বক্তব্য লুকিয়ে রয়েছে। চিঠির যেমন পুনশ্চ অংশ থাকে তেমনি গল্পের মধ্যেও যে পুনশ্চ অংশ জুড়ে দেওয়া যায় এবং তার মাধ্যমে গল্পের মূল বক্তব্য তুলে ধরা যায় 'আজকের গল্প' গল্পটি তার উদাহরণ। উপস্থাপন রীতির দিক থেকে রমাপদ চৌধুরী বেশ কিছু গল্পে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, তা বাংলা গল্প সাহিত্যের রূপরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশিষ্টতার দাবি রাখে।

গল্পের প্রারম্ভ

ছোটগল্পের প্রারম্ভে রমাপদ চৌধুরী বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কোন কোন গল্পের শুরু চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের পরিচয়ের মাধ্যমে, কোন কোন গল্পের শুরু নঞর্থক বাক্যের মাধ্যমে। কোন কোন গল্পের শুরুতেই প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। স্থান নির্দেশের মাধ্যমেও শুরু হয়েছে কোন কোন গল্প।

প্রথম বাক্যেই চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঃ

১) "বিষ্ণুরামের মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে।" ('উদয়স্ত', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ০১)।
২) "রোগীদের বিদায় দিয়ে অন্দরমহলে ঢুকলো সুকোমল।" ('শিশুমেধ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৪৪)।

নঞর্থক বাক্যের মাধ্যমে গল্পের শুরু ঃ

১) "শিবপ্রসাদবাবু অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন না।" ('টাকার দাম', 'গল্পসমগ্র', পৃ ৩৭৬)।
২) "বউরানী একা ফিরলেন না।" ('বউরানী', 'গল্পসমগ্র', পৃ ৫৩৮)।

গল্পের শুরুতে প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহারঃ

১) "ভোর হয়ে গেছে?" ('রোমান্স', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৮১৭)।
২) "শহরলুটিয়া চেনেন? শহরলুটিয়া?" ('দু'বার বাঁচা', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৫৩৮)।

স্থান নির্দেশের মাধ্যমে গল্পের শুরু ঃ

১) "মোগলসরাই স্টেশনে এসে ট্রেনটা যখন পৌঁছল রাত দশটা বেজে গেছে।" ('নষ্টনারী', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৩৩২)।
২) "ঝাঁসী হয়ে ভূপাল যাবার পথে ভীলসা স্টেশন।"('মাধবিকা', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৩২২)।

সংলাপের মাধ্যমে গল্পের শুরু ঃ

১) "দেখেছি, দেখেছি নতুন মাস্টারমশাইকে।" ('গুরুদন্ড', 'গল্পসমগ্র', পৃ ৮২৮)।
২) "আমি বললাম, আপনি তো কিছুই দেখলেন না।" ('পাথরপ্রতিমা', 'গল্পসমগ্র', পৃ ৬৯৪)।

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পের সমাপ্তিতে রয়েছে ব্যঞ্জনা। তাঁর 'জ্বালাহর', 'তিতির কান্নার মাঠ', 'দাম', 'তীরধনুক', 'আজকের গল্প' ইত্যাদি গল্পের সমাপ্তিতে রয়েছে চমক। 'জ্বালাহর' গল্পের সমাপ্তিতে স্বামী সুরঞ্জনকে উদ্দেশ্য করে শিউলির 'শ্যামলী তো সান্ত্বনা পায়' ('গল্পসমগ্র', পৃঃ ১১৭) উক্তিটিতে শ্যামলের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও চমকে উঠে। 'তিতির কান্নার মাঠ' গল্পে অরুণিমার "মেয়েরা যাকে প্রত্যাখ্যান করে, তারই দয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে বড় লজ্জা যে তাদের নেই সুনীতদা।" ('গল্পসমগ্র', পৃঃ ১৭৮) উক্তিতে পাঠক চমকিত হয়। আর তারই সূত্র ধরে গল্পকথকের স্বীকারোক্তিতেই গল্প সমাপ্ত হয় – "কিন্তু আমি জানব, মৃত্যু নয়, আত্মনিঃশেষ।"('গল্পসমগ্র', পৃঃ ১৭৮)।

'তীর-ধনুক' গল্পের সমাপ্তিতে বিধবা অনুপমার স্বপ্নভঙ্গে পাঠক হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে। 'দাম' গল্পের সমাপ্তিতে অনন্তর চিঠি বিক্রির অনিচ্ছা এবং নিরঞ্জনের সামনেই চিঠিটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলায় নিরঞ্জনের মতো আমরাও হতভম্ব হই। মনে হয় যেন এই ধরনের সমাপ্তির জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না।

রমাপদর কোন কোন গল্পের সমাপ্তি হয়েছে প্রশ্নের মাধ্যমে। 'আলমারিটা' গল্পের অতিশয় ভদ্রলোক মামার কাছ থেকে পাওয়া অতিকায় আলমারিটা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তাই গল্পের সমাপ্তিতে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন – "ওটাকে নিয়ে এখন কি করি বলো তো?" ('গল্পসমগ্র', পৃঃ ৫৫৭)। যদিও প্রশ্নকর্তা নিজেই জানেন না যে তার এই প্রশ্ন কার উদ্দেশ্যে। 'মনবন্দী' গল্পের সমাপ্তি বাক্যে তাত্ত্বিক ছাপ স্পষ্ট – "মানুষ সুখী হতে চায়, না সুখে আছি এ কথা জানিয়ে সুখী হয়?" ('গল্পসমগ্র', পৃঃ ২২৮)। 'শিশুমেধ', 'নতুন চশমা', 'শেষ হয়না', 'ঋণ' প্রভৃতি গল্পের সমাপ্তিতেও একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন –

১) "ন্যায়, নীতি, ধর্ম? আইন, সমাজ, সংসার? ধ্যুৎ!" ('শিশুমেধ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৫৩)।
২) "কিন্তু তাই একটা কথার কোন অর্থটা সঠিক তা কি নতুন চশমার চোখে দেখতে পাব?" ('নতুন চশমা', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৩৪৪)।

নঞর্থক বাক্যের মাধ্যমে গল্পের সমাপ্তি ঃ

১) "কিন্তু অসত্যের কালিমা মাখিয়ে তার চরিত্রকে বিকৃত করতে ইচ্ছে হয় না, সাহিত্যের খাতিরেও না।" ('যুবতী ধরম', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৩১১)।

২) "আমরা চরিত্র বানাই, চরিত্র বুঝি না।" ('একটি মডেল গল্প', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৮৪০।

অনুচ্ছেদ বিন্যাস ঃ

ছোট-বড়-মাঝারি বড় সব রকমের অনুচ্ছেদ বিন্যাস করেছেন রমাপদ চৌধুরী তার বিভিন্ন ছোটগল্পে। কোন গল্পে দেখা যায় এক লাইনের অনুচ্ছেদ। কোন গল্পে পাঁচ লাইনের, আবার কোন কোন গল্পে দশ বা বারো লাইনের অনুচ্ছেদ রয়েছে। তবে রমাপদর গল্পে ছোট ধরনের অনুচ্ছেদ নির্মাণ বেশি লক্ষ্য করা যায়।

ছোট অনুচ্ছেদ

১) "বউরানী একা ফিরলেন না।" ('বউরানী', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ২২২)।
২) "মাথা হেঁট করে কি যেন ভাবছিল অপর্ণা। বেশ মনে পড়ে তার আজ।" ('পঙ্গু', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৭৬১)।

প্রকৃতির বর্ণনা

সাহিত্যে প্রকৃতি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। যুগে যুগে কালে কালে কবি সাহিত্যিকরা প্রকৃতি চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যে। এই প্রকৃতি কাব্য সাহিত্য থেকে গল্প সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। গল্পকার রমাপদ চৌধুরীর বিভিন্ন গল্পে প্রকৃতি স্থান পেয়েছে সাবলীল ভাবে। লেখকের ছোটগল্পের প্রকৃতি বর্ণনায় সাদা ও নীল রঙের ব্যবহারের আধিক্য দেখা যায়। রাতের প্রকৃতি তাঁর গল্পে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার প্রকৃতি তার নানা রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। গল্পের রস কিংবা ঘটনার মতো উপভোগ্য সন্ধ্যা প্রকৃতির চিত্র। পুকুর, নদী, সবুজের সমারোহ, ধানের জমি প্রভৃতি নানা উপকরণগুলো বিভিন্ন গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার। লেখক তাঁর গল্পে রাতের গা ছমছম করা প্রকৃতির চিত্র যেমন এঁকেছেন, তেমনি তাঁর বর্ণিত ভোরের প্রকৃতি স্নিগ্ধতার ছোঁয়া দিয়ে যায়। আবার সন্ধ্যার প্রকৃতি মনকে দোলা দেয়। বর্ষার প্রকৃতি চিত্রণে বর্ষার পাশাপাশি আনুষঙ্গিক অন্যান্য চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। কালো মেঘ, জ্যোৎস্না, চাঁদ, বৃষ্টি, বরফ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি রমাপদ ছোটগল্পে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। দুপুরের নিস্তব্ধতা যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে লেখকের গল্পে।

ভাষা ব্যবহার

"ভাষা দিয়ে গড়ে উঠে রচনার চরিত্র, চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, প্লটের বিন্যাস প্রভৃতি।"**৯** রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পের ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। ভিন্নধর্মী ভাষা ব্যবহার করে চরিত্রের সামাজিক অবস্থানকে প্রকাশ করেছেন তিনি। চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষাবৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করেছেন লেখক। ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি, বিলাসপুর, ছত্রিশগড়, রাঁচি, রামগড় প্রভৃতি অঞ্চলের সাঁওতাল ও মুন্ডা ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা রমাপদর আদিবাসী জীবননির্ভর গল্পগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। এই আদিবাসী ভাষা বা সাঁওতাল জনজাতির মুখের ভাষা স্থান পেয়েছে গল্পকারের 'জলরঙ', 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী', 'রেবেকা সোরেনের কবর', 'মন্ত্র', 'মানুষ অমানুষের গল্প', 'ঝুমরা বিবির মেলা', 'দরবারী' প্রভৃতি গল্পে। কোলিয়ারীতে কর্মরত মুন্ডা ধাওড়ার মেয়ে রূপমণির প্রতিবাদী ভাষা 'জলরঙ' গল্পে চিত্রিত। "আও দিনসকাল খাটবে আউর আধা-হাজরি করবে।"**১০** অর্ধেক হিন্দী অর্ধেক বাংলা মেশানো এই ভাষা রমাপদর অন্যান্য মধ্যবিত্ত জীবননির্ভর গল্পগুলির থেকে আলাদা।

সাঁওতাল জনজাতির মুখের ভাষা স্থান পেয়েছে 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী' গল্পের সংলাপে। লাটুয়া ওঝার সংলাপে এই জনজাতির ভাষা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে – "ইটা ডুডাং গাছের মূল। চন্দন আর ডুডাং ঘষে তিনদিন লাগাবি কত্তা। বিষ আখন বুকে উঠছে, ডুডাং লাগালি মাটিতে বাইরবে।"**১১** প্রত্যেকটি আদিবাসী চরিত্রের মুখে রমাপদ তাদের নিজস্ব ভাষা দিয়েছেন যা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে। 'আপুং' (বাবা), 'তুয়ার' (তোর), 'পাইছোন' (পেয়েছে), 'বুলছে' (বলছে), 'বিয়া' (বিয়ে), 'উ' (সে), কেনে (কেন) ইত্যাদি আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষাকে তাদের মুখে স্থাপন করেছেন লেখক। এই জনগোষ্ঠীর আদিবাসীরা হিন্দী বাংলা মিশিয়ে একটা আলাদা ধরনের আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি করেছিল। তাদের ভাষায় 'মরদ', 'কাম', 'ডর', 'নজর', 'দিল্লাগী', 'ভুখা' ইত্যাদি হিন্দী শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

বাক্যসজ্জা

ছোটগল্পের বাক্যসজ্জায় রমাপদ চৌধুরী নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কোন কোন স্থানে বাক্যকে গতানুগতিকভাবে পরিবেশন করেছেন, আবার একই বাক্যে ক্রিয়াপদের স্থান পরিবর্তন করে বাক্যে বৈচিত্র্য এনেছেন। যেমন- "হয়তো সুস্মি আসবে। রাতের অন্ধকারে হয়তো লুকিয়ে চলে আসবে সুস্মি। ('বনবাতাস', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ২৯) এই উদাহরণটি প্রথম বাক্যে ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে ব্যবহৃত। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে মাঝে সরে গেছে ক্রিয়াপদ। বিশেষ্যপদ সুস্মিরও স্থান পরিবর্তন ঘটেছে এখানে। বাক্যগঠনের এই রীতির আরেকটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক - "দূরে কোথায় যেন বাঁশি বাজছে। সাঁওতালী বাঁশের বাঁশির সুর ককিয়ে ককিয়ে বেজে উঠেছে, ভেসে আসছে মিঠে সুরের নিভাষ গান। বাঁশি বাজছে দূরে কোথায়। ('শিশুমেধ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৪৬-৪৭)। লক্ষণীয় বিষয়, বাঁশি বাজার এই খবরটি তিনটি বাক্যে তিন রকম করে সাজিয়েছেন লেখক। প্রথম বাক্যে ক্রিয়াপদটি বাক্যের শেষে (SOV), দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়াপদটি উপস্থাপিত হয়েছে বাক্যের মাঝে (SVO)।

একই শব্দকে বারবার ব্যবহার করে বাক্যগঠনে বৈচিত্র্য এনেছেন রমাপদ চৌধুরী। যেমন – "কত টাকা চাও তুমি, বলো, বলো তুমি, কত টাকা চাও যে টাকা সারা জীবনে পাবে না, যে অঙ্কের স্বপ্নও তুমি দেখোনি- কত টাকা চাও তুমি? ("শিশুমেধ' 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৫১)। রমাপদ চৌধুরীর গল্পে এক বিশেষ ধরনের বাক্যসজ্জা দেখা যায়, যাতে একই খন্ড বাক্য বা বাক্যাংশ বা শব্দ বারবার ব্যবহারের মাধ্যমে বাক্যে গতি ও ধ্বনিগত বাকসুষমা এসেছে। বাক্যগঠনের এই পদ্ধতিকে বলা হয় ট্রান্সফর্মড-রিপিটিশন প্যাটার্ন বা TRP।**১২** বাক্যগঠনে কর্তা (Subject), কর্ম (Object), ক্রিয়ার (Verb) অবস্থানের যে প্রচলিত রীতি অর্থাৎ SOV প্যাটার্ন, সবসময় রমাপদ মানেননি। যেমন– "ভয় করছিল বাসনার।" ('স্বর্ণমারীচ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৮৩) SOV পদ্ধতিতে লেখা হয় "বাসনার ভয় করছিল"। কিন্তু রমাপদ কর্মকে প্রথমে নিয়ে গিয়ে কর্তাকে শেষে এবং ক্রিয়াপদকে বাক্যের মাঝে বসিয়েছেন. অর্থাৎ OVS পদ্ধতিতে বাক্যসজ্জা করেছেন। একই বাক্যকে উল্টে পাল্টে বাক্যগঠনে অভিনবত্ব এনেছেন লেখক- "যদি জীবনে থাকতো শান্তি। যদি এতটুকু শান্তি থাকতো তার জীবনে।" (স্বর্ণমারীচ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৮৭)।

বাক্য গঠনের বিশিষ্ট ভঙ্গী রমাপদ গল্পকে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছে – "সীতাকে প্রথম যেদিন দেখলাম, সেদিন সীতাকে আমি দেখিনি।" (মদিরক্ষিণা', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ১৯৯)। এই বাক্যের একটা স্পষ্ট অর্থ হল গল্পকথক সীতাকে প্রথম যেদিন দেখেছিলেন, সেদিন তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করেননি। অথচ তার

অবয়বগত উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন। থীসিস-অ্যান্টিথীসিস রিলেশন (T.A.R.) বা বিরোধমূলক অথবা বিপরীতার্থক এই বাক্যসজ্জার মাধ্যমে লেখক নিজ বক্তব্যকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত 'গত যুদ্ধের ইতিহাস' গল্পে এই ধরনের বাক্যগঠন দেখা যায় – "একটা আনির তখন কোনও দাম নেই বলেই একটা আনিরও তখন অনেক দাম।" ('গল্পসমগ্র', পৃঃ ৪৪৭)। দ্ব্যর্থবোধক ও বিপরীতার্থক বাক্যবিন্যাসের এই পদ্ধতিটি রমাপদকে ছোটগল্পের লেখক হিসেবে স্বতন্ত্র মূল্য দান করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সংলাপ

সংলাপ চরিত্রকে প্রাণ দান করে। একটি চরিত্রের কোন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, অপর চরিত্রের উত্তর দান সংলাপের অঙ্গ। কিন্তু রমাপদ চৌধুরী কোন কোন স্থানে এই বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে সংলাপের অন্য রীতিকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, পর পর তিনটি চরিত্রের মুখে শুধু তাদের বক্তব্যই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর স্থান পায়নি যেমন -
"গীতালী এতক্ষণে বললে, আপনার ট্রেনের এখনো অনেক দেরী।"
"অনিলেন্দু বললে, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।"
"আমি বললাম, আমরাও তো এই ট্রেনে চলে যেতে পারতাম।" ('মৃত-অমৃত', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৪৮৪)
পর পর তিনটি বাক্যে বিশেষ্যপদকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে দেখা যাক –
১) "একটু পরেই শুভা ভেতরের দরজা দিয়ে ঢুকল।"
২) "শুভা আমার দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেল।"
৩) "আমি শুভার দিকে তাকিয়ে কোনও কথা বলতে পারলাম না।" ('আমরা সবাই একসঙ্গে', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৫৬১)।

শব্দ ব্যবহার

শব্দ ব্যবহারে রমাপদ চৌধুরীর গল্পগুলির স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারে। একই শব্দকে পর পর দু'বার ব্যবহার করে রমাপদ তাঁর অনেক গল্পে অন্য মাত্রা এনেছেন। যেমন-
১) "জ্যোতিষবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন সমুর বিয়ে তো তা ব্যবস্থা করছি, ব্যবস্থা করছি।" (কুসীদাশ্রিত', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৩৭)
২) "তুমি, তুমি সত্যি বড় বোকা।" ('শিশুমেধ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৪৬)।
৩) "রাণীবাঁধের বধূরাণী আমি, টাকার অভাব হবে না যার কোনদিন, টাকা, টাকা।" ('বউরানী', তদেব, পৃঃ ৫১)।

দীর্ঘ সময় বুঝাতে এবং সংখ্যার প্রাচুর্য বুঝাতে একই শব্দকে রমাপদ 'ঝিনুকের কৌটো' গল্পে দু'বার কিভাবে ব্যবহার করেছেন দেখা যাক –
১) "কত কত দিন পার হয়ে গেছে তারপর, কত বছর।" ('গল্পসমগ্র', পৃঃ ৪২৯)।
২) "ঝিনুক, ঝিনুক, রাশি রাশি রঙ বেরঙের ঝিনুক।" (তদেব, পৃঃ ৫২৯)।

সাধারণত বাক্য গঠনের সময় প্রথম বাক্যে একবার বিশেষ্যের ব্যবহার করে পরবর্তী বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলে বিশেষ্যর স্থানে সর্বনামের প্রয়োগ হয়। কিন্তু রমাপদ তাঁর গল্পের বিভিন্ন স্থানে এই নিয়ম অনুসরণ করেননি, বরং পর পর দু'বার বিশেষ্যের ব্যবহার করেছেন। এটি গল্পকারের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন - "অনু নিঃশ্চুপ, অনু নিঃশব্দ।" ('বনবাতাস', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৩০)। এখানে তিনি "অনু নিঃশ্চুপ, সে নিঃশব্দ" এভাবে বাক্যগঠন করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি দু'বার 'অনু' (বিশেষ্য) শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। এরকম আরও দৃষ্টান্ত তাঁর বিভিন্ন গল্পে পাওয়া যায়। দু'বার এমনকি তিনবারও তিনি পাশাপাশি বিশেষ্যের ব্যবহার করেছেন। যেমন -
১) "মহিলাটির দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। নিভা, নিভা।" ('বয়স', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৫৭৯)।
২) যমুনা হঠাৎ ছেলেমানুষীর সুরে বলে উঠলো, নিশীথ, নিশীথ, নিশীথ, আমি যাচ্ছি।" ('ছোট পৃথিবীর গল্প', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৬৪৭)।

গল্প রচনা করতে গিয়ে রমাপদ চৌধুরী কিছু বিশেষ শব্দ, বিশেষণ কিংবা বিশেষ নামকে ব্যবহার করেছেন। অবসন্নতা বুঝাতে তিনি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন 'অবসাদী' শব্দটি। যেমন– 'অবসাদী চোখ' (আড়াল), 'অবসাদী সৌন্দর্য' ('সহযোগ') ইত্যাদি। সাদা রঙকে তিনি বিভিন্ন গল্পে ব্যবহার করেছেন। যেমন -
১) "দুধের মত সাদা জর্জেট।" ('স্বর্ণমারীচ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৮৬)।
২) "নিপাড় সাদা জর্জেটখানা পেঁচিয়ে পড়লে সে।" ('আড়াল', তদেব, পৃঃ ৭২৮)।

অলংকার ব্যবহার

অলংকারের ব্যবহার বাক্যকে করে তুলে সৌন্দর্যমন্ডিত। কাব্যে সাহিত্যে অলংকারের ব্যবহার নতুন কিছু নয়। অলংকৃত বাক্য যে কোন সাহিত্যের সম্পদ। রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পে বিভিন্ন বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অলংকারের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ছেকানুপ্রাস অলংকার

১) "যন্ত্রের যন্ত্রণা।" ('তিনতারা', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৭২)।
২) "যন্ত্রের যন্ত্রণা যেখানে মানুষের বুকে দেয় অসহ্য নীরবতা।" ('শিশুমেধ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৪৬)।
৩) "অলংকারের কলঙ্ক রাখলে না দু'হাতে।" ('স্বর্ণমারীচ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৮৫১)।

বৃত্ত্যনুপ্রাস ও লাটানুপ্রাস অলংকার

১) "জানি জানি, দেখতে যে ভালো নই সে আমি জানি।"(লাটানুপ্রাস) ('ড্রেসিং টেবল্', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৫৯৭)।
২) "মাহাতো গায়ের লোকগুলো চলে গেল কল কল কথা বলতে বলতে, খল খল হাসতে হাসতে।" (বৃত্ত্যনুপ্রাস) ('ভারতবর্ষ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৫৬৮)।
৩) "দূরে কোথায় যেন বাঁশি বাজছে। সাঁওতালী বাঁশের বাঁশির সুর ককিয়ে ককিয়ে বেজে উঠেছে, ভেসে আসছে মিঠে সুরের নিভাষ গান। বাঁশি বাজছে দূরে কোথায়।(বৃত্ত্যনুপ্রাস ও লাটানুপ্রাস) ('শিশুমেধ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৪৬-৪৭)।

উপমা অলংকার

১) "শিশির ভেজা শ্বেত কমলের মতো সাদা আকাশ।"('তিনতারা', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৭২)।
২) "বাতাস ঠান্ডা ঠান্ডা আর নরম রেশমের মতো।" ('আতসী উজ্জ্বল', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৯৫)।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকার

১) "আঁকাবাঁকা টুংরী নদীর জল। চমক দিচ্ছে সূর্যের কিরণ লেগে। যেন এক ফালি ভাঙ্গা বিদ্যুৎ।" ('বনবাতাস', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৩০)।

অপহ্নুতি অলংকার

১) "এ হাসি নয়, এ কৌতুক করুণাশ্রিত।" ('তিতির কান্নার মাঠ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ১৭২)।

চিত্রকল্প, রূপক, উপমা ও প্রতীক

মানুষের জীবনের বিভিন্ন অনুভূতিগুলিকে পাঠকের মনে রূপময় করে তুলতে প্রয়োজন চিত্রকল্পের। "চিত্রকল্প বলতে বোঝায় চিত্র-সদৃশ বা চিত্রের মত। চিত্র বা দৃষ্টি, চোখে দেখার সামগ্রী, কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় সংবেদনে, যেখানে শুধু চোখে দেখার অভিজ্ঞতা নয়, ধ্বনি, স্পর্শ, ঘ্রাণ, রসনার আস্বাদন ইত্যাদি নানা ইন্দ্রিয় স্বাদ মিলিত হয়ে থাকে সে সব ক্ষেত্রে কবিরা চিত্রকল্পের সুদক্ষ প্রয়োগে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।১৩

কবিদের মতোই কথাশিল্পীরাও চিত্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা রাখেন। তাঁরা কথার মাধ্যমে ছবি আঁকেন, স্মৃতিকে জাগ্রত করেন। রমাপদ চৌধুরীর গল্পেও চিত্রকল্প ব্যবহারের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'বনবাতাস' গল্পের আরতিদিকে তার অতীত ঘিরে রেখেছে। অতীত স্মৃতিই নিঃসঙ্গ আরতিদেবীর সহায়। রমাপদ চৌধুরী ব্যক্তির অসহায়তাকে চিত্রিত করেছেন প্রাণীর অনুষঙ্গে – "চারিদিকে নিঝুম, শুধু গ্যাস পোস্টগুলো দাঁড়িয়ে আছে মাথার মণি জ্বালিয়ে, পিচঢালা রাস্তাটা চকচক করছে। দূরে কোথায় যেন দুটো প্যাঁচা ডেকে উঠল।" ('শিশুমেধ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৪৯)।

রমাপদর গল্পে চরিত্র চিত্রণ পরিপূর্ণতা পায় প্রকৃতির অনুষঙ্গে – "এদিকে রাত বাড়ে। হিম পড়তে শুরু করে। তবু চমৎকার একটা আমেজ, কত কত তারায় ভরা আকাশ, বাতাস ঠান্ডা আর নরম। রেশমের মতো। আর ঘুম ঘুম রোমাঞ্চ। দয়িত স্পর্শের শিহরণ। আমলকির পাতা নড়ে। কৃষ্ণচূড়ার পাতা নড়ে। শিমুল আর শিশু গাছের চন্দ্রছায়া কেঁপে ওঠে।" ('আতসী উজ্জ্বল', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৯৫)। গল্পের সরমার কল্পনায় দয়িতের স্পর্শকামনার আর প্রকৃতির চিত্রণ একাকার হয়ে যায়। এভাবেই রমাপদ রেশমের স্পর্শের মত দয়িতের স্পর্শের অনুভব করান চরিত্রকে।

রমাপদ চৌধুরী ছোটগল্পের চিত্রকল্পে রঙের ব্যবহার করেন। তাঁর গল্পে সাদা ও নীল রঙের ব্যবহারের আধিক্য দেখা যায় –

১) "শিশির ভেজা শ্বেত কমলের মতো সাদা আকাশ।" ('বনবাতাস', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৩০)।
২) "পশ্চিমাংশের জাফরানের বন ক্রমশ লীলাভ হয়ে এল।" ('আতসীউজ্জ্বল', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ১০০)।

অসংখ্য চিত্রকল্প ছড়িয়ে রয়েছে রমাপদর ছোটগল্পগুলিতে। 'আতসীউজ্জ্বল' গল্পে সরমার রূপ বর্ণনায় উপমার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। "একটি ভ্রমরাকাঙ্ক্ষী রজনীগন্ধার কলির মতো। উদ্দাম আর চঞ্চল। উন্মাদনা আর চঞ্চলতা।" ('গল্পসমগ্র', পৃঃ ৯২)।

শব্দ ব্যবহারে বা বাক্য ব্যবহারের সময় রমাপদ পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপমা বা রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন –

১) "কবরস্থানের মতো নিশ্চুপ পড়ে আছে সারা বিশ্ব, কোথাও নেই এতটুকু আওয়াজের লেশ।" (উপমা), ('বনবাতাস', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ২৪)।
২) "বাড়ন্ত মেয়ের আঙ্গুলের মতো ফাঁপালো শরের বন, সাদা ফুলের শিষ, আর তার উপর দিয়ে বয়ে যায় হালকা হাওয়ার হিল্লোল।" (উপমা), ('শিশুমেধ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ৪৫)।

উপমা বা রূপকের উদাহরণ রমাপদর গল্পগুলোতে ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন –

১) "চোখ তাঁর ফাঁসুড়ে জজের জানালায়।" (রূপক), ('খুনীবউ', 'গল্পসমগ্র', পৃঃ ২৪৪)।
২) বরফের মোত মসৃণ মাদকতা ছিল তাঁর দেহে।" (উপমা), ('ঘুম', তদেব, পৃঃ ৭৮৯)।

"আধুনিক সাহিত্যের আত্মা ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগানোর সোনার কাঠি, রূপার কাঠি হল প্রতীক বা Symbol এবং চিত্রকল্প বা Image। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এরা মিলে মিশে থাকে।**১৪** রমাপদ চৌধুরীর অনেক গল্পে রূপক আর উপমা মিলেমিশে থাকে, আর প্রতীক বা Symbol ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। 'বুড়ী ডিহিঙের সাঁকো' গল্পে সাঁকোটি লখিন্দর-দময়ন্তীর সম্পর্কের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। 'নতুন চশমা' গল্পে রহস্যময়ী লহনার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পেরে গল্পকথক আর পুরোনো চশমাটি নিতে প্রাক্তন প্রেমিকার কাছে ফিরে যান না। তার বদলে আবার নতুন চশমা কিনে নতুনভাবে এই পৃথিবীকে দেখতে চান। কথকের এই চিন্তাভাবনায় গল্পের সমাপ্তিতে এক মুহূর্তেই চশমাটি হয়ে ওঠে চরম বাস্তবতার প্রতীক।

আপট্রেন' গল্পে যেমন চলমান ট্রেনটি হয়ে ওঠে মানব জীবনের গতিশীলতা বা চলমানতার প্রতীক, 'চাবি' গল্পের চাবিটি হয়ে উঠে জীবনের জট খোলার প্রতীক। 'বড়বাজার' গল্পের কেনাবেচা সর্বস্ব বড়বাজারটি হয়ে উঠে মানুষের ভোগ ও সর্বস্বতার প্রতীক। তেমনি 'তিনতারা' গল্পের তিনটি তারা হয়ে দাঁড়ায় খ্যাতি, ঐশ্বর্য ও প্রেমের প্রতীক। যে প্রেম চরম বাস্তববাদী ও মানুষের স্বার্থপরতাকে চিহ্নিত করে। 'তিতির কান্নার মাঠ' গল্পের অরুণিমার শূন্য হৃদয় মাঠের প্রতীকে গল্পে উপস্থাপিত হয় আর অরুণিমার হৃদয়ের কান্না তিতিরের কান্নার

সঙ্গে তুলিত হয়। 'ঝিনুকের কৌটো' গল্পে গীতার মেয়ের গুঁড়ো দুধের কৌটোতে ঝিনুক ভরে রাখার প্রতীকে তার অতীত জীবনের স্মৃতি জাগ্রত হয়। মনে হয় যেন তার জীবনও তেমনি এক ঝিনুকের কৌটো। চিত্রকল্প, উপমা, রূপক ও প্রতীকের ব্যবহারে লেখকের ভাব গভীরতা ও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। গল্পের পাত্র-পাত্রীর মনোভাব, পরিবেশ, লেখকের জীবন উপলব্ধি সবকিছুই ফুটিয়ে তুলতে উপমা, রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্প সহায়তা করেছে।

উল্লেখপঞ্জী ঃ

১) ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, 'প্রাচ্য রীতিবাদ এবং প্রতীচ্যের শৈলীবিজ্ঞান', দ্রষ্টব্য : 'শৈলীচিন্তা চর্চা', বিপ্লব চক্রবর্তী (সম্পাদিত), রত্নাবলী, ১ম প্রকাশ, ২০০৩, পৃঃ ১৫।
২) দত্ত, হর্ষ, 'নিজের উপন্যাস : শৈলীর সন্ধানে', দ্রষ্টব্য : তদেব, পৃঃ ৩৩৩।
৩) সরকার, পবিত্র, 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি', 'সাহিত্যলোক', ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫, পৃঃ ১৩৫।
৪) মজুমদার, ড. অভিজিৎ, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০৭, পৃঃ ৮৪।
৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বর্ষাযাপন', 'সোনার তরী', বিশ্বভারতী, ১ম প্রকাশ, ১৩০০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৫)।
৬) সরকার, পবিত্র, 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫, পৃঃ ১৬১)
৭) মজুমদার, ড. অভিজিৎ, 'শৈলীবিজ্ঞান তত্ত্ব ও স্বরূপ', দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫, পৃঃ ১৫।
৮) হোসেন, সোহরাব, 'ছোটগল্প পরিক্রমা', করুণা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০০৫, পৃঃ ১০২।
৯) মজুমদার, ড. অভিজিৎ, 'শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০৭, পৃঃ ৮৪।
১০) চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় নতুন সংস্করণ, ১৯৯৯, 'জলরঙ', পৃঃ ২১৭।
১১) চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় নতুন সংস্করণ, ১৯৯৯, 'লাটুয়া ওঝার কাহিনী', পৃঃ ২৩৪)।
১২) ঘোষ, ড. সুদক্ষিণা, 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ সাহিত্যের নির্মাণশিল্প', ভাষা ও সাহিত্য', ১ম প্রকাশ, ২০০৬, পৃঃ ৩০০।
১৩) মিশ্র, ড. অশোককুমার, 'আধুনিক বাংলা কবিতাr রূপরেখা', দে'জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০২, পৃঃ ৩৩৪।
১৪) দাস সুর, সুমনা, 'বিমল করের কথাসাহিত্য', 'এবং মুশায়েরা', কলকাতা-৭৩, পৃঃ ৩৬৯)।

গ্রন্থপঞ্জী

মূল গ্রন্থ ঃ

১) চৌধুরী, রমাপদ, 'গল্পসমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, ২য় নতুন সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯৯।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

১) চক্রবর্তী, বিপ্লব, (সম্পাদিত), 'শৈলীচিন্তা চর্চা', রত্নাবলী, ১১Aব্রজনাথ মিত্র লেন, কলি-৯, ১ম প্রকাশ, জুলাই, ২০০৩।
২) চট্টোপাধ্যায়, ড. গিরীন্দ্রনাথ, 'শৈলীবিজ্ঞান পরিচিতি', প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৭৩, ১ম প্রকাশ, ২০০৭।
৩) সরকার, পবিত্র, 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি', 'সাহিত্যলোক', ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫।
৪) মজুমদার, ড. অভিজিৎ, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০৭।
৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বর্ষাযাপন', 'সোনার তরী', বিশ্বভারতী, ১ম প্রকাশ, ১৩০০ বঙ্গাব্দ।
৬) রায়, ড. অপূর্বকুমার, 'শৈলীবিজ্ঞান', দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬।
৭) মজুমদার, ড. অভিজিৎ, 'শৈলীবিজ্ঞান তত্ত্ব ও স্বরূপ', দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫।
৮) হোসেন, সোহরাব, 'ছোটগল্প পরিক্রমা', করুণা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০০৫।
৯) মজুমদার, ড. অভিজিৎ, 'শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০৭।

১০) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ‘বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা’, দে’জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, জুন, ২০০৪।
১১) ভট্টাচার্য, ড. সাধনকুমার, ‘শিল্পদর্শন ও সাহিত্য সমালোচনা’, দে’জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, ২০০৪।
১২) ঘোষ, ড. সুদক্ষিণা, ‘রবীন্দ্র প্রবন্ধ সাহিত্যের নির্মাণশিল্প’, ভাষা ও সাহিত্য’, ১ম প্রকাশ, ২০০৬।
১৩) মিশ্র, ড. অশোককুমার, ‘আধুনিক বাংলা কবিতাr রূপরেখা’, দে’জ পাবলিশিং, ১ম সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০২।
১৪) দাস সুর, সুমনা, ‘বিমল করের কথাসাহিত্য’, ‘এবং মুশায়েরা’, কলকাতা-৭৩।
১৫) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ‘কালের পুত্তলিকা’, দে’জ পাবলিশিং, ৩য় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৪।
১৬) মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, ‘সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি’, দে’জ পাবলিশিং, কলি-৭৩, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০৮।
১৭) চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, ‘সাহিত্যের রূপ রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’ রত্নাবলী, কলি-৯, ১ম মুদ্রণ, আগষ্ট, ১৯৯৫।